Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 922 - 932
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 – 0848

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসদের ভূমিকা

মৃদুল বনিক
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : banik.sindrani@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Razakar, Al-Badr, Al-Sham, Perpetrators, Massacre, Raped, Voluntary, Paramilitary.

Abstract
Razakar, Al-Badr, Al-Sham and Shanti Committee were the paramilitary forces formed at the time of the Bangladesh Liberation War in 1971 to support the Pakistani military against minority Hindu and Awami League supporters. The Razakars were selected from the Bihari community who lived in East Pakistan and migrated from Bihar after 1947. The Razakars were also selected from pro-Pakistani Bengalis who supported an undivided Pakistan. Razakar, Al-Badr and Al-Sham were involved in brutal massacres and human rights abuses during the war. These subsidiary forces had secured the Pakistani army's local support, food, insights and intelligence on targets and locations. The student wing of the religious political party Jamaat-e-Islami also provided them with logistical support like men and information. Initially, these auxiliary forces were only called volunteers and were part of civil defence. But from May 1971 onwards, these perpetrators were formally organized into Razakar, Al-Badr and Al-Shams. They were trained by the Pakistani military. They killed thousands of innocent people during the war and thousands of women and girls were raped and sexually assaulted. This paper will explore the heinous activities of these perpetrators. The paper will also examine the reasons behind the creation of these voluntary groups.

Discussion

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগি কিছু আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেগুলো হল - শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এইসকল সশস্ত্র আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সকল সংগঠনের সদস্যদের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করা, পাকিস্তান সেনাদের বিভিন্ন অভিযানে সহযোগিতা করা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া, এলাকার মেয়ে ও মহিলাদের নিয়ে এসে পাকিস্তানি ক্যাম্পে তুলে দেওয়া, পাকিস্তানি বাহিনীর খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং গণহত্যায় সম্পৃক্ত থাকা। এই সকল কুখ্যাত সংগঠনের অধীনে বাঙালীরা যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত উর্দুভাষী বিহারীদের অনেকে তাতে যোগ দেয়। পাকিস্তান বাহিনী তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এই রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজাকাররা স্থানীয়ভাবে খুব সক্রিয় ছিল, পাকিস্তানি বাহিনী যখন অভিযান পরিচালনা করত তখন স্থানীয় রাজাকাররা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো কোথায় মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ লুকিয়ে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের ২৮ মে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করে এই বাহিনীকে আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'শান্তি কমিটি'র তত্ত্বাবধানে ছিল রাজাকার বাহিনী। সাধারণত, শান্তি কমিটির নেতারাই রাজাকার বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে এইসব আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হত এবং তারা প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজাকার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল জামায়াতে ইসলামীর হাতে। অন্যদিকে, আল-বদর বাহিনী ছিল শিক্ষিত। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীরা আল-বদর বাহিনীর সদস্য ছিল। আল-বদরদের বর্বোরোচিত কাজ ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার করা।

রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গাড়ে তোলার কারণ : ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশের ভেতরে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বা সংগঠন গড়ে উঠেছিল, এগুলো হল - শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস। যুদ্ধের সময় 'শান্তি কমিটি' গঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিরা। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জামায়েত ইসলামীর নেতা গোলাম আযম এবং মুসলিম লীগের নেতা খাজা খয়েরউদ্দিন। রাজাকার ছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীন একটি আধাসামরিক বাহিনী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এই সশস্ত্র আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। গঠন হওয়ার পাঁচ মাসের মাথায় এই আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাজাকার বাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানে বসবাসকারি উর্দুভাষী বিহারি জনসংখ্যা থেকেও নিয়োগ করেছিল। রাজাকার বাহিনীতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল। এদের কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করা ও গণহত্যায় সম্পৃক্ত থাকা।[১] অন্যদিকে, আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীরা এ বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আল-বদর বাহিনীর তিন থেকে পাঁচ হাজার সদস্য ছিল। বাহিনীটির প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, যিনি স্বাধীন বাংলাদেশে পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর আমির হন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে একটি সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে আল-শামস গঠিত হয়। আল-শামস বাহিনীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ইসলামী ছাত্রসঙ্ঘের বাছাই করা ব্যক্তিদের নিয়ে এই আল-শামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীর সাথে জামাত ইসলামের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। এদের লক্ষ্য ছিল জামাতি ইসলামের নীতি অনুসরণ করা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা। তাদের আরেকটি লক্ষ্য ছিল আওয়ামীলীগের সদস্যদের হত্যা করা। এরা মানবতা বিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যায় যুক্ত ছিল। এছাড়া আল-শামস বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও ছিল প্রায় তিন হাজারের অধিক।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে কিন্তু তখনকার সময়ের সব থেকে বড় বাধা ছিল তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুরা এবং পরবর্তীতে আওয়ামিলীগের সমর্থক ব্যক্তিরা। যারা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন সমালোচনাসহ তাদের ইসলামীক সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান চেয়েছিল পূর্ব বাংলায় উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রথম বিরোধিতা করেছিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সেই সময় বড় চাকরিতে এবং ব্যবসা-বানিজ্যে যুক্ত ছিল হিন্দুরা। পাকিস্তানের আইন সভায় বেশকিছু প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ ছিল হিন্দু। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ২৬ শতাংশ হিন্দুরা। পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার তাই এমন নীতি নিয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হিন্দু শূন্য করতে হবে। হিন্দু শূন্য পূর্ব পাকিস্তানের সেই পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং সরকারের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু গ্রাম গুলো ধ্বংস করা এবং হিন্দুদের হত্যা করা। এই উভয় কাজ পরিচালনার জন্য তাদের দরকার ছিল স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা। কারণ স্থানীয় আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা বাঙালি হিন্দু গ্রামগুলোর ঠিকানা দিতো এবং তাদের রাস্তা দেখিয়ে সেই গ্রামগুলোতে নিয়ে যেতে। গনহত্যার পূর্বে এই হিন্দু গ্রাম এবং হিন্দুদের জনসংখ্যা সম্পর্কে রাজাকার ও আল-বদরেরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খবর দিতো। এই সকল উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিছু আধাসামরিক বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই সময় যে আনসার বাহিনী ছিল সেই বাহিনীর প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই এই আনসার বাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং সেই আনসার বাহিনীর স্থানে গঠন করা হয় রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনী। এই সকল আধাসামরিক বাহিনী যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের অভিযানে অংশ নিতো ও তাদের রাস্তা দেখিয়ে হিন্দু গ্রামগুলোতে নিয়ে যেতো এবং হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করত। এই সকল রাজাকারেরা মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধ সম্পর্কে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের খবর পৌঁছে দিতো। রাজাকারদের অন্য কাজ ছিল যুবতী মেয়ে এবং মহিলাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানী ক্যাম্পে রেখে আসা। এই সকল মেয়ে এবং মহিলাদের উপর পাকিস্তানি সেনারা অমানবিক ধর্ষণ ও নির্যাতন করত।[২] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রতিটা হিন্দু গ্রামে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার, আল-বদরদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।[৩] তারা হিন্দুদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল, মেয়ে এবং বউদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে এবং পুরুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে হত্যা করাতো। অনেক সময় হিন্দুরা রাজাকারদের এবং আল-বদরদের সামনে বলত যে তারা মুসলমান তাই তাদের বাছাই করার জন্য আল-বদর ও রাজাকারেরা হিন্দু বাঙালি পুরুষদের কাপড় খুলে তাদের পুরুষাঙ্গ দেখে তাদের সনাক্ত করতো সে সত্যিকারের হিন্দু না মুসলমান। এই সময় খ্রিস্টান ধর্মের মানুষদের তুলনামূলকভাবে কম হত্যা করা হত। তারা খ্রিস্টানদের চিহ্নিত করতো তাদের গলার ক্রুশ চিহ্ন দেখে। খ্রিস্টানদের বলা হত মালায়ন কারন তারা গলায় ক্রুস চিহ্ন পরে থাকতো। খ্রিস্টানদের হত্যা না করার কারণ ছিল তৎকালীন সময়ে আমেরিকার সমর্থন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি।

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, রাজাকার একটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী। যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তার জন্য ১৯৭১ খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন পাকিস্তানপন্থী ব্যক্তিকে নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়।[৪] এরপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ বাহিনীর জন্য সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং তারা প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাজাকার বাহিনী গঠনের পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ, যিনি পরবর্তীতে দলটির নায়েবে আমির হন।[৫] তিনি রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং খুলনায় শান্তি কমিটির প্রধান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি'র আহবায়ক ড. এম এ হাসান বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর 'ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স' গঠন করা হয়।[৬] তিনি জানান, এর অধীনে রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস্ বাহিনী গঠন করা হয়। এই সকল বাহিনীর অধীনে বাঙালীরা যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারী উর্দুভাষীদের অনেকে তাতে যোগ দেয়।[৭] পাকিস্তান বাহিনী তাদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ও হাতে অস্ত্রও তুলে দিয়েছিল।

রাজাকারদের ভূমিকা : পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার আধ্যাদেশ' জারি করে এই বাহিনীকে আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।[৮] ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'শান্তি কমিটি'র তত্ত্বাবধানে ছিল রাজাকার বাহিনী। শান্তি কমিটির নেতারাই রাজাকার বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতেন। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজাকার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল জামায়াতে ইসলামীর হাতে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ করা হয়েছিল জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ ইউনুসকে। অনেক রাজাকার

সদস্য অবশ্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও কাজ করতেন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং ড. এমএ হাসান – দু'জনই বলেছেন যে রাজাকার বাহিনীতে যারা কাজ করতেন, তাদের নাম মুক্তিযুদ্ধের সময় সংশ্লিষ্ট থানায় লিপিবদ্ধ ছিল। ড. এমএ হাসান বলেন, রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতো, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে আনতো, হত্যা করত কিংবা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতো। আনসার বাহিনীতে যারা ছিল তারা ছিল বাঙালি। পাকিস্তান বাহিনীকে ধারণা দেওয়া হল যে, এদের বিশ্বাস করা যায় না; এরা অনেকে পালিয়ে যেতে পারে, কেউ কেউ পালিয়েও গেছে। তাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আনসার বাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারেনি। গণহত্যা শুরুর প্রথম দিকেই এই আনসার বাহিনীকে ভেঙে দেয়া হয়। এই আনসার বাহিনীর পরিবর্তে গঠন করা হয় রাজাকার বাহিনী। এ কারণেই শহরাঞ্চলে যেখানে বিহারিরা ছিল সেখানে তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। রাজাকাররাও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নিতো, প্রশিক্ষণ নিতো। তৎকালীন দলিলপত্র থেকে জানা যায়, কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনসংলগ্ন মাঠে এবং মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মাঠে রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। আজাদুর রহমান চন্দন তাঁর 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা' বইয়ে লিখেছেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এক লাখ সদস্যের রাজাকার বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫০ হাজার নিয়োগ দিয়েছিল। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে চন্দন লিখেছেন, রাজাকারদের দুই থেকে চার সপ্তাহের ট্রেনিং দেওয়া হত। অস্ত্র হিসেবে দেওয়া হতো 'থ্রি নট থ্রি' রাইফেল। প্রথম দিকে একজন রাজাকারের মাসিক বেতন ছিল ৯০ টাকা। তা বাড়িয়ে ১ ডিসেম্বর থেকে একজন রাজাকার সদস্যের মাসে ১২০ টাকা, রাজাকার প্লাটুন কমান্ডারের ১৮০ টাকা এবং রাজাকার কোম্পানি কমান্ডারের ৩০০ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়।[৯] জেনারেল রাও ফরমান আলীকে উদ্ধৃত করে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরের এক রিপোর্টে বলা হয়, ওই সময় পর্যন্ত রাজাকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ হাজারে। জেনারেল টিক্কা খান সারা দেশে বাধ্যতামূলকভাবে অনেক চোর, ডাকাত ও সমাজবিরোধীকেও রাজাকার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজাকাররা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিতো। পাকিস্তান সরকার রাজাকারদের অর্থ প্রদান করত। অখন্ড পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় সমর্থকরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাজাকারদের সংখ্যা বাড়াতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করার জন্য তাদের আরও অস্ত্র দেওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের বিরোধীদের এবং নকশালদের সমূলে উৎপাটন করতে। রাজাকার ও আল-বদরেরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পরিচালনা করত, সেখানে সাধারণ মানুষদের আটকে রেখে অত্যাচার করত এবং মেয়েদের ধর্ষন করত।[১০] রাজাকার বাহিনীকে চার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ব্রিগেডে সংগঠিত করা হয়েছিল। এরা প্রধানত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দেওয়া হালকা পদাতিক অস্ত্রে সজ্জিত। প্রতিটি রাজাকার ব্রিগেড দুটি পাকিস্তান নিয়মিত আর্মি ব্রিগেডের সহায়ক হিসেবে সংযুক্ত ছিল এবং তাদের প্রধান কাজ ছিল স্বাধীনতাক আমি বাঙ্গালীদের আটক করা এবং পরবর্তীতে তাদের হত্যা করা। রাজাকারদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী অস্ত্র চলানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কয়েকজন কুখ্যাত রাজাকার ছিল গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আবদুল কাদের মোল্লা, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর। রাজাকারেরা নির্দিষ্ট ভাতার বিনিময়ে তারা সরকারের হয়ে দুইভাবে কাজ করত। একদল পাকিস্তানের সপক্ষে মানুষকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চালাত। আর একদল অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সাধারণ মানুষদের হত্যা করত। রাজাকারেরা গ্রামে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে পাক সেনার হাতে তুলে দিতো।[১১] রাজাকাররা স্থানীয় নিরীহ মানুষদের বাড়ি থেকে যুবতী মেয়ে ও নারীদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে দিয়ে আসতো। বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু ও আওয়ামী লীগের সমর্থনকারী পরিবারগুলোকে তারা নিশানা করত। কখনো কখনো তারা নিজেরাও যুবতী মেয়ে ও নারীদের ধর্ষণ করত। যে সকল নারীদের ছোট শিশু থাকতো রাজাকাররা তাদের শিশুদের প্রথমে হত্যা করত তারপর তার মাকে ধর্ষণ করত। ছোট্ট শিশুদের তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিতো এবং পরবর্তীতে সেই শিশুকে তার মায়ের সামনে হত্যা করত। আর যেসব যুবতী মেয়ে ও নারীদের পাকিস্তানি ক্যাম্পে রেখে আসতো তাদের উপর চলত লাগাতার ধর্ষণ ও অমানবিক অত্যাচার। এই সকল যুবতী মেয়ে ও মহিলাদের পাকিস্তানি সেনারা তাদের ক্যাম্পে আটকে রাখতো এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে

মহিলা গুলোকে অমানবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ করত। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই সকল মেয় ও নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনার ক্যাম্পগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ যুবতী নারী ও মেয়েদের উদ্ধার করা হয়েছিল। রাজাকাররা পাকিস্তানি সেনাদের সাথে থাকতো এবং হিন্দু ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো। শুধুমাত্র নোয়াখালী শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৫০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, পাঁচ হাজার মহিলার ধর্ষণ করেছে এবং ১০ লাখ ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।[১২]

আল-বদর বাহিনীর ভূমিকা : জামায়েত ইসলামের শিক্ষিত লোকের নিয়ে তৈরি হয়েছিল আল-বদর বাহিনী। এই আল-বদর বাহিনী ছিল মূলত তাদের বুদ্ধিজীবী সংগঠন। আল-বদরদের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন অভিযানের এবং গণহত্যার নীলনকশা তৈরি করা। তাদের এই পরিকল্পনা গুলো তারা পাকিস্তানি সেনাদের সামনে তুলে ধরতেন। পরবর্তীতে তারা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করত। আল-বদরদের অন্যান্য দায়িত্ব ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। আল-বদর ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের উপর নৃশংসতা অত্যাচার চালায়। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার রায়ের বাজার এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞ। আল-বদর তৈরি হওয়ার পর এই বাহিনী মূলত শহরাঞ্চলে কাজ করে। আর গ্রামাঞ্চলে মূলত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতো রাজাকার বাহিনী। আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যে আদর্শ ধারণ করতো তা বেশ শক্ত ছিল। দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে আল-বদর বাহিনী নিজেদের সম্পর্কে বলে, আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়। আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই! যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর বা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল। ২২ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে জামালপুর শহরে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়।[১৩] দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে ইসলামি ছাত্রসংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলে, আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনাদের এ দেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩।[১৪] এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে ৩১৩ জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১৫] আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটা একই রকম। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। ইসলামি ইতিহাসের বদর যুদ্ধকে আদর্শ করে এই বাহিনী গঠিত হলেও এদের মূলকাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া। ১৯৭১ সালের মে মাসে রাজাকার বাহিনী গঠনের আগেই এপ্রিল মাসে গঠিত হয় আল-বদর বাহিনী। গবেষক আজাদুর রহমান চন্দন মতে একাত্তরে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়েছিল। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। তিনি ১৯৭১ সালে ছিলেন তখনকার জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান। এই ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়েই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী মিলিশিয়া হিসেবে গঠিত হয়েছিল আল-বদর বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে শেষ কয়েক মাসে এই আল-বদর বাহিনী ঢাকা এবং অন্যত্র পরিকল্পিত ভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। মতিউর রহমান নিজামী নিজেই তখন সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে আল-বদর বাহিনীকে বর্ণনা করেছিলেন 'পাকিস্তানের শত্রুদের কাছে সাক্ষাত আজরাইল' বলে। যাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু বলে মনে করা হয়েছিল তাদের নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী দ্বারা। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা তৈরি হলে এই তালিকা ধরে হত্যাকাণ্ডের বাস্তবায়ন করে আল-বদর বাহিনী। আল-বদর বাহিনী যুদ্ধের পুরো সময় তাদের কার্যক্রম চালালেও মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দুদিন আগে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করে। বাংলাদেশ ওয়ারক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির প্রধান ড: এম এ হাসান বলেছেন, "আল-বদর বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পাকিস্তান বাহিনী তাদের হাতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ তুলে দিতো, মাসিক ভাতা দিতো। প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বিভিন্ন অপারেশনে যেতো আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা। যাদেরকে শত্রু মনে করতো তারা তাদের সম্পর্কে খবরাখবর নিতো, তুলে নিয়ে যেতো ও গোপন হত্যাকাণ্ড চালাতো। কখনো পাকিস্তান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেনাবাহিনীর হাতেও তুলে দিতো"। গবেষক সাইয়েদ ওয়ালি রেজা নাসের তার 'দ্য ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রিভলিউশন : দ্য জামায়াতে ইসলামী অব পাকিস্তান' শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন, "একাত্তরে সরকারের অণুপ্রেরণায় ইসলামী ছাত্রসংঘ হয়ে ওঠে জামায়াতে ইসলামীর মূল শক্তি। সেনাবাহিনীর সহায়তায় এরা আল-বদর ও আল-শামস নামে দুটি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। ইসলামী ছাত্রসংঘের তখনকার নাজিম-ই আলা (প্রধান) মতিউর রহমান নিজামী আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর আল-বদর বাহিনীর অনেকেই পালিয়ে পাকিস্তান ও ভারতসহ অন্যান্য দেশে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ দল ছিল। পাকিস্তানের আই.এস.আই-এর সহায়তা তারা পাকিস্তানে নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা পরিবেশ এবং মৌলবাদের আদর্শ কায়েম করার জন্য তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। তাদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা। পরবর্তীতে ইসলামী মৌলবাদী আদর্শের অনুকৃত সরকার দ্বারা দেশ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। তাদের আদর্শ এখনো রয়ে গেছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ভেতর।

আল-বদরেরা যুদ্ধের সময় নারকীয় তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল। আব্দুল খালেক ছিলেন আল-বদর বাহিনীর অন্যতম প্রধান সদস্য। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় আব্দুল খালেকের বয়স ছিল ২৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে, শিক্ষিত, দেখতে বেশ স্মার্ট ও মুখে ছিল সুন্দর দাড়ি। আল-বদর গোষ্ঠীর সদস্যরা যে নর-মুন্ডগুলি তাদের সদর দপ্তরে নিয়ে আসতো, তার জন্য প্রতি মাথাপিছু আব্দুল খালেক নগদ টাকা দিতো। তবে নর-মুন্ডের দর খুব বেশি ছিল না। এতে অবশ্য নরমুন্ডশিকারিদের মনে কোনো রকম ক্ষোভ ছিল না। কারণ, নরমুন্ডের সংখ্যা হাজার হাজার ছিল তাতে তাদের পুষিয়ে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে নরমুন্ড পিছু আড়াই টাকা দেয়া হত।[১৬]

আল-শামসদের ভূমিকা : শিক্ষিত ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের ভেতর থেকে বাছাই বাছাই বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল আল-শামস বাহিনী। এরা ছিল মূলত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রধান স্থানীয় বুদ্ধিজীবী। এই বাহিনীর উপদেশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মেনে চলত। আল-শামস বাহিনী বড় বড় গণহত্যার পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করত আর সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আল-শামস বাহিনীতে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাড়াও মুসলিম লীগপন্থী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও মাদ্রাসা ছাত্ররা যুক্ত ছিল। আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটা একই রকম। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীর প্রচারযন্ত্র দৈনিক সংগ্রাম এর মাধ্যমে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও যুদ্ধের ডাক দিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠন করে সে বাহিনীর আমীরের পদ গ্রহণ করলে তৎকালীন ছাত্রসংঘের কর্ণধার, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আবদুল কাদের মোল্লার নেতৃত্বে আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রসংঘের আমীর ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর আমীরের পদ গ্রহণ করেন এবং সারা বাংলাদেশে প্রচারণা, সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা নগর ছাত্রসংঘের আমীর ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদও এসব বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। আল-শামস অবকাঠামো রক্ষা করত এবং সেনাবাহিনীকে রসদ ও গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করত। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আল-শামস ফজলুল কাদের চৌধুরীর অধীনে ছিল এবং চট্টগ্রামে তার ছেলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে ছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক এমপি সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এবং সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী। তারা সাতকানিয়া, রাউজান, বোয়ালখালী, পটিয়া ও রাঙ্গুনিয়ার আশেপাশে জিপে টহল দিতো। তারা হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতো এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতি সমর্থক বলে সন্দেহ করত এমন কাউকে গ্রেপ্তার করতো। সন্দেহভাজনদের সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাসভবন 'গুডস হিলে' নিয়ে যাওয়া হতো, যেটিকে টর্চার সেলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেখানে তাদের নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তাদের লাশ কর্ণফুলী নদীতে ফেলা হত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর আল-

শামস ও আল-বদর নেতৃত্ব যৌথভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করে। আল-শামস এবং আল-বদর নেতারা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে দেখা করে এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা চূড়ান্ত করে।

বাংলাদেশের গণহত্যায় বিহারী মুসলমানদের ভূমিকা : ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বিহার থেকে মুসলমান উদ্বাস্তুরা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ১৯৭১ সালের বাঙালি নিধনযজ্ঞে বিহারী মুসলমানেরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সর্বত্রভাবে সহায়তা করেছিল এবং তারা নিজেরাও গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকার মিরপুর অঞ্চল এক কুখ্যাত ও ভয়ংকর অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর এই অঞ্চলে কোন বাঙ্গালী প্রবেশ করলে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। ঢাকার এই শহরতলী অঞ্চলে কমপক্ষে লক্ষাধিক বিহারী মুসলমানের বসবাস। পাকিস্তানি সেনারা গত নয় মাস ধরে বিহারী মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করেছে আর বিহারীরাও বাঙালীদের ওপর নিষ্ঠুর হামলা চালিয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে এই বিহারী মুসলমানরা আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই বিহারী মুসলমানদের আশঙ্কা বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যরা চলে গেলে তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাই বিহারীরা চায় না যে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সরে যাক। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারী মুসলমানদের অনেকেই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিজেদের ভারতীয় বলে চালাবার চেষ্টা করছে। তাদের বেশিরভাগই ভারতে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং অনেকে চলেও গিয়েছিল।[১৭]

রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসরা যে সকল গণহত্যার সাথে যুক্ত ছিল : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব নৃশংস গণহত্যাগুলো সংঘটিত হয়েছিল তার পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা ছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং শান্তি কমিটির। এদের দ্বারা সংগঠিত কিছু গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল - চুকনগর গণহত্যা একটি পরিকল্পিত গণহত্যা যা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও এদেশীয় রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর সহায়তায়, সংঘটিত হয়। গণহত্যাটি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর। এটি বিশ্বের কোনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ একক গণহত্যা।[১৮] পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা ও অত্যাচারের মুখে প্রাণের ভয়ে খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, চালনার লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্য তখন খুলনার ডুমুরিয়া হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছানো। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া। ভারতীয় সীমান্তে পাড়ি জমাতে হলে ডুমুরিয়া পর্যন্ত ভদ্রা নদী দিয়ে নৌকায় আসা ছিলো অপেক্ষাকৃত অনেকটাই সহজ। কারণ এরপর সাতক্ষীরা হয়ে ভারতীয় সীমান্ত। তাছাড়াও নদীপথে যাতায়াত সুবিধা ও অনেকটা নিরাপদ। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনাগোনা নেই বললেই চলে। আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগরের চারপাশ তখন নিচু এলাকা। কেবল চুকনগর বাজারটা তখন খানিকটা উঁচু। তখন আটলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন গোলাম হোসেন। শান্তি বাহিনীর সদস্য গোলাম হোসেন এবং ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার শামসুদ্দিন খাঁ নামের এক বিহারী ১৯ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাতক্ষীরা ক্যাম্পে যোগাযোগ করে বললেন, চুকনগর বাজারের বর্তমান অবস্থার কথা। হিন্দুদের ঢল নেমেছে চুকনগরে। পাকিস্তানি ক্যাম্পে যোগাযোগ করার পরে হানাদারেরা খবর পেয়ে একটি ট্রাক ও একটি জিপে করে সেনা পাঠায়। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই সকল নিরীহ হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। তাতে মারা যায় অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশুরা।[১৯] তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন প্রায় ১২ হাজার নিরীহ মানুষ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারকীয় গনহত্যা ঘটেছিল চট্টগ্রামের পরৈকোড়া। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা পরৈকোড়া, বাথুয়াপাড়া ও পূর্বকন্যারা গ্রামে বাঙ্গালী হিন্দুদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত উক্ত তিন গ্রামে ২২টি জমিদার পরিবার বসবাস করত। চট্টগ্রাম শহরের অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী একাত্তরের মার্চে তাঁদের পরিবার–পরিজন নিয়ে পড়ইকোরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রামের বাসিন্দা ও শহর থেকে আসা লোকজনের নিরাপত্তা দিতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র পাহারা ব্যবস্থা করেন। রাজাকার ও মুসলীম লীগ নেতা খায়ের আহমদ চৌধুরী ওরফে খয়রাতি মিয়া চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে এই তথ্য দেয়। ১৯৭১ সালের

২১মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পড়ইকোরা গ্রাম আক্রমণ করে। ২১মে সকাল ৯টার দিকে চট্টগ্রাম শহর থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ৩৭টি সৈন্যবোঝাই ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ি পড়েকোড়া, বাথুয়াপাড়া ও পূর্বকন্যারা গ্রামে প্রবেশ করে। খায়ের আহমদ চৌধুরী ও তার সহযোগীরা পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের নিয়ে পরৈকোড়া হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে হামলাশুরু করলে মুক্তিযোদ্ধারাও প্রতিরোধ শুরু করে এবং তাদের প্রতিরোধের মুখে কমপক্ষে ৩ জন রাজাকার মারা যায়। অতর্কিত প্রতিরোধের ফলে পাকবাহিনী প্রথমে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক আক্রমণ বন্ধ রেখে পরে আরো সৈন্য ও রাজাকারদের নিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়। নির্বিচারে গ্রামের হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গুলি ও ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কুপিয়ে পুরুষদের হত্যা করা হয়। হিন্দু নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। হিন্দু বাড়ি থেকে লুট করে নেওয়া গবাদি পশু দিয়ে রাজাকার খয়রাতি মিঞা পাকিস্তান বাহিনীর জন্য ভোজের আয়োজন করে। ১৯৭১ সালের ২১মে সকাল ১০টা হতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের হত্যালীলায় ১৭৬ জন পুরুষ সহ মোট ২৭৬ জন হত্যাকাণ্ডে মারা যান।

আতাইকুলা গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত নৃশংস হত্যা যজ্ঞ। পাবনা জেলার আতাইকুলা গ্রামের হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল সকাল ৯টা হতে বিকেল ৬টা পর্যন্ত রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনা হত্যালীলা চালায়। ৫২ জন মানুষ হত্যাকাণ্ডে মারা যায়।

ঢাপঢুপ গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে স্থানীয় চিহ্নিত রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার পাঁচপীর ইউনিয়নের ইসলামপুর ও শুকানপুকুরিসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সংগঠিত হত্যাকান্ডকে বোঝায়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের এই হত্যাকাণ্ডে ৩৫০০ জন সংখ্যালঘু হিন্দুদের গুলি করে ও কুপিয়ে করে হত্যা করা হয়।

আখিরা গণহত্যা ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার বাড়ইহাটের নিকটে অনুষ্ঠিত একটি গণহত্যা। স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী হিন্দুদের ওপর এই গণহত্যা সংঘটিত করে। গণহত্যায় প্রায় ১০০ জন হিন্দু প্রাণ হারান বলে ধারণা করা হয়।

বাগবাটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল বৃহত্তর পাবনার পূর্ববর্তী জেলা সিরাজগঞ্জ উপ-বিভাগের বাগবাটি ইউনিয়নে। আল-বদর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সমন্বয়ে ২০০ নিরস্ত্র সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল। গণহত্যার একদিন আগে রাজাকার ও শান্তি কমিটির মধ্যে ঘোড়াছাড়া স্কুলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বাগবাটি, হরিণোপাল এবং অলোকদিয়ার পাঁচ শতাধিক লোককে হত্যা করা হবে। ১৯৭১ সালের ২৭মে সকালে, একটি যৌথ অভিযানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আল-বদর, রাজাকার এবং পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গ্রামগুলিকে ঘিরে ফেলে। আল-বদররা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২০০ লোককে হত্যা করেছিল। এছাড়াও তারা হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং লুটপাট করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মহিলাদের ধর্ষণ করেছে।

বকচর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৩ মে পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার বকচর গ্রামে। বকচর গ্রামে আক্রমণের পরিকল্পনা মূলত শান্তি কমিটির একটি বৈঠকে গৃহীত হয়েছিল। ঐ গ্রামের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী কর্তৃক হিন্দুদের হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মেয়েদের ও মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল।

ডাকরা হত্যাকাণ্ড গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২১শে মে খুলনা জেলার বাগেরহাট উপ-বিভাগে শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের দ্বারা ডাকার গ্রামে নিরস্ত্র হিন্দু উদ্বাস্তুদের গণহত্যা করা হয়। বাগেরহাট উপ-বিভাগীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রাজাব আলী ফকিরের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। গণহত্যাতে ২০০০ এরও বেশি হিন্দু পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয়। ২১ মে বিকালে রাজব আলী ফকিরের নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন রাজাকারের একটি দল দুই নৌকায় ডাকারে পৌঁছে। রাজাকারেরা নৌকা থেকে নেমে কালী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। যার ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায় ও আহত হয়।

পাকিস্তান বাহিনীর দালাল রাজাকার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ খুলনার কালিকাপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীধনঞ্জয় দাসের বৃদ্ধা দিদিমা কুমুদিনী দেবী ও মা সুভাষিনী দাস অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর পূর্ব বাংলার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা শুরু হলে খুলনার আতঙ্কিত নর-নারী ও শিশুরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লাভের আশায় কালিকাপুর গ্রামটিকে তাদের সামরিক আশ্রয়স্থল রূপে নির্বাচন করে। এই গ্রামের সহায়তায় তারা দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এই সংবাদ রাজাকার বাহিনীর কাছে পৌছলে তারা জুলাই মাসে কালিকাপুর গ্রামে হানাদার এবং গ্রামের সাহায্যকারী যুবক নিমাই দাস কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর কালিকাপুর গ্রামের প্রায় সমস্ত অধিবাসী প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ধনঞ্জয় দাসের মা সুভাষিনী দাস তাঁর ৯০ বছরের বৃদ্ধা মা, কুমুদিনী দেবীকে একা ফেলে পালিয়ে না এসে সে সেই প্রায় জনশূন্য পরিত্যক্ত গ্রামে বাস করতে থাকেন। এই অবস্থায় ৭ই অক্টোবর কুমুদিনী দেবী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করেন। বর্বর রাজাকার বাহিনী তাঁর মৃতদেহ সৎকার করারও অনুমতি দেয়নি। এরপর শোকে দুঃখে ও মানসিক নির্যাতনে ধনঞ্জয় দাসের মা শোভাষিনী দাস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং গত ৯ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[২০]

বাংলাদেশকে বুদ্ধিজীবী শূন্য করার পরিকল্পনা করেছিল আল-বদর বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে পাকবাহিনী ও রাজাকার, আল-বদর এবং আল-শামস দেশের জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তুলে নিয়ে হত্যা করে।[২১] তবে বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপকতা ছিল যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে।[২২] বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল দেশীয় আল-বদর বাহিনী। পাকিস্তানি বাহিনী যখন বুঝতে পারে যে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তখন নবপ্রতিষ্ঠিতব্য বাংলাদেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল এবং পঙ্গু করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নিরপরাধ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে। আল-বদর বাহিনীর মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর দিনে ও রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে মিরপুর ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করে।[২৩] আল-বদর আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে প্রায় একশত বুদ্ধিজীবীকে ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করা হয়।[২৪] এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বধ্যভূমি ও গন কবর আবিষ্কার করা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ও দেশীয় রাজাকার, আল-বদলরা নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে আসতো বধ্যভূমিতে। সকলকে চোখ বাধা অবস্থায় সারি দিয়ে দাঁড় করানো হত, তারপর তাদের গুলি করে হত্যা করা হতো।[২৫] শুধুমাত্র খুলনা শহরেই প্রায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল রাজাকার, আল-বদর ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।[২৬]

ঢাকার বুড়িগঙ্গার জলে দাঁড় করিয়ে ২০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। ঢাকার কাছে হরিহরপাড়া গ্রামটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক বদ্ধ শিবিরে পরিণত করেছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই গ্রামের প্রায় কুড়ি হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, 'প্রতি সন্ধ্যায় পাকিস্তানি ঘাতকরা বুড়িগঙ্গার তীরে দলে দলে টেনে এনে তাদের হাটু সমান জলে ভেঙে যেতে বাধ্য করত। তারপর পাক বাহিনীর নরপিশাচরা তাদের গুলি করে হত্যা করত এবং এই সময় বাঙালি নর-নারী ও শিশুদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠত। অতি সকালে গ্রামের মাঝিদের তাদের নৌকা নিয়ে যেতে বলা হত। এই মাঝিরা মৃতদেহ গুলি মাছ দরিয়ায় ফেলে দিয়ে আসতে বাধ্য হত।[২৭]

১৯৭১ সালের গণহত্যা সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দেশীয় রাজাকার আলবোদেররা সৃষ্টি করেছিল বধ্যভূমি। এই বদ্ধভূমিতেই নিরীহ মানুষদের ধরে এনে নিশংসভাবে হত্যা করা হত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কয়েক হাজার বদ্ধভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টের বারোটি গণকবর পাওয়া গিয়েছিল যেখানে ৭ হাজার মানুষের নর কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছিল।[২৮] ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিদিন নর্দমা ও জলাভূমি থেকে অসংখ্য মাথার খুলি, কঙ্কাল, হাড় ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যাচ্ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজাকার বিরোধী আন্দোলন : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামশ ও শান্তি কমিটির সদস্যরা আত্মগোপন করে এবং অনেকে ভারতে পালিয়ে আসে।[২৯] রাজাকারদের তৎপরতা ও অত্যাচারের মাত্রা এতই ব্যাপক ছিল যে এখন দেশ ও সমাজবিরোধী যেকোনো তৎপরতাকে 'রাজাকারি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। হুমায়ূন আহমেদের একটি নাটকের সংলাপ 'তুই রাজাকার'ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বহুব্রীহি নাটকে এক টিয়ের ঠোঁটে 'তুই রাজাকার' শব্দগুচ্ছ বলিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। কেউ তাদের দিকে আঙুল তুলে যখন ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারতেন না, সেই স্বৈরাচার আমলে হুমায়ূন আহমেদ নাটকে তুলে আনেন এক পাখি চরিত্র যাকে বলতে শেখানো হয় - 'তুই রাজাকার'।[৩০] জাহানারা ইমামের 'ঘাতক-দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি সামনে আসে। স্বদেশের জন্মশত্রু, স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তুললেন দুর্বার আন্দোলন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তিনি এগিয়ে এলেন। একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৮১ সালে জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজম পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। এরপর তার নানা ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। শেষপর্যন্ত খোলস ছাড়িয়ে ১৯৯১ সালে গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচন করা হয়। তার আগেই জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বি.এন.পি সরকার গঠন করে। গোলাম আজমের রাজনীতিতে ফিরে আসার প্রতিবাদ জানাতেই গড়ে উঠেছিল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। তখনই দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৯২ সালের ১৯শে জানুয়ারি জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতি শুরুর দিকে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল। ১৯৯৪ সালে এক প্রতিকী বিচারের মাধ্যমে গোলাম আজমের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। যেটিকে তারা 'গণ আদালত' বলে বর্ণনা করেন।

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির সদস্যরা মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লাখ মানুষকে পাকিস্তানবাহিনী, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটি হত্যা করেছে, প্রায় দুই লাখ মা-বোনদের ধর্ষন করেছে, বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। নিরপরাধ মানুষের ওপর এমন অত্যাচার পৃথিবীতে বিরল। নতুন প্রজন্মের কাছে ঘাতক রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির বর্বরোচিত গনহত্যার তুলে ধরা খুবই জরুরি।

Reference:

১. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন - ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৮১

২. Nayanika Mookherjee, The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971, London: Duke University Press, 2015, 35

৩. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন - ২য় খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), ৯২

৪. আজিজুল পারভেজ, 'রাজাকার ছিল অর্ধলক্ষাধিক', কালের কণ্ঠ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ https://www.kalerkantho.com/online/first-page/2019/12/15/851128

৫. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৫

৬. আকবর হোসেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে গঠন করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী, বি.বি.সি বাংলা, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯। https://www.bbc.com/bengali/news-50818613

৭. আজাদুর রহমান চন্দন, একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা, (ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), ৬৫

৮. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১০

৯. আজাদুর রহমান চন্দন, একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা, (ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯), ৩৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 105
Website: https://tirj.org.in, Page No. 922 - 932
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. Jahanara Imam, Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh's War of Independence, (University Press Limited, 1998), 85
১১. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ২য় খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), ৯২
১২. দৈনিক বসুমতি, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১ এবং ৫
১৩. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৬
১৪. উদিসা ইসলাম, "জামায়াতের কাছে মানবতাবিরোধী অপরাধ এখনও কথিত" বাংলা ট্রিবিউন, ৭ জানুয়ারি ২০১৬
১৫. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১১
১৬. দৈনিক বসুমতি, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. দৈনিক বসুমতি, ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২, পৃ. ৫
১৮. Sarmila Bose, Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh War, (New York: Oxford University Press, 2011), 115
১৯. Sarmila Bose, Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh War, (New York: Oxford University Press, 2011), 118
২০. দৈনিক বসুমতি, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২, পৃ. ৫
২১. Kalyan Chaudhuri, Genocide in Bangladesh, (New Delhi: Orient Longman, 1972), 25
২২. National Herald, 20 December 1971, p. 7
২৩. সুফিয়া কামাল, একাত্তরের ডায়েরী, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ১৯৮৯), ১২৮
২৪. National Herald, 24 December 1971, p. 1
২৫. দৈনিক বসুমতি, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. দৈনিক বসুমতি, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৭. দৈনিক বসুমতি, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. দৈনিক বসুমতি, ১৮ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৭
২৯. দৈনিক বসুমতি, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
৩০. মুনতাসীর মামুন, রাজাকারের মন- ১ম খণ্ড, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), ১৯